কারাগারেও যখন জীবন নিরাপদ ছিল না

অজয় দাশগুপ্ত

বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট তাঁর বাসভবনে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হয়েছিল। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যারা চায়নি- দেশের ভেতরে এবং বাইরে, তারাই এ হত্যাকাণ্ডে জড়িত ছিল। বঙ্গবন্ধু নিজের বাসভবনে নিরাপদ ছিলেন না। অধিকতর নিরাপদ স্থান গণভবনে তাঁকে বসবাসের জন্য অনুরোধ করা হয়েছিল। কিন্তু রাজী হননি। 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে ঘিরে কিছু ঘটনা ও বাংলাদেশ' গ্রন্থে ড. এম এ ওয়াজেদ মিয়া লিখেছেন, গণভবনে যেতে শাশুড়িও রাজি ছিলেন না। এর কারণ হিসেবে বললেন- সরকারি ভবনের আরাম-আয়েশে প্রতিপালিত হলে তাঁর ছেলেমেয়েদের মনমানসিকতা ও আচার-আচরণে অহমিকাবোধ ও উন্নাসিক ধ্যান-ধারণা সৃষ্টি হবে। [পৃষ্ঠা ১৭৪]

বঙ্গবন্ধুর বাসভবনটি এখন জাদুঘর। ১৫ আগস্ট যেমন ছিল তেমনটিই রাখা হয়েছে। ওই বাসভবনে কোনো এসি মেসিন বা কার্পেট ছিল না, সোফাসেটও না। বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিবের রান্না ঘরে এখনও রয়েছে তাঁর ব্যবহার করা হারিকেন। সে সময় বিদ্যুৎ সংকট প্রকট ছিল। রাষ্ট্রপতি ও জাতির পিতা শেখ মুজিবুর রহমান আর সব মানুষের সঙ্গে এ দুর্ভোগ ভাগাভাগি করে নিয়েছেন। তিনি সম্মতি দিলে সর্বক্ষণ বিদ্যুতের ব্যবস্থা করা যেত, জেনারেটরও রাখা যেত। কিন্তু তিনি হারিকেনের আলো বেছে নিয়েছেন।

১৫ আগস্টের হত্যাকাণ্ড থেকে নারী-শিশু কেউ রেহাই পাননি। ১০ বছরের শিশু রাসেলকে পিতামাতার শয়নকক্ষেই হত্যা করা হয়েছে। নববিবাহিত দুই তরুণীকে তাদের স্বামী বীর মুক্তিযোদ্ধা শেখ কামাল ও শেখ জামালের সঙ্গে হত্যা করা হয়েছে। শিশু আরিফ সেরনিয়াবাত ও সুকান্ত বাবুকেও নিজেদের বাড়িতে হত্যা করা হয়েছে। ৩ নভেম্বর মধ্যরাতে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে ব্রাশফায়ারে হত্যা করা হয় মুক্তিযুদ্ধের সময়ের অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম, প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদ, অর্থমন্ত্রী মনসুর আলী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এম কামারুজ্জামানকে। তাঁরা জেলখানাতেও নিরাপদ ছিলেন না। বঙ্গবন্ধু হত্যার পরপরই জাতীয় চার নেতা ছাড়াও আবদুস সামাদ আজাদ, কোরবান আলী, শেখ আবদুল আজিজ, জিল্লুর রহমান, আমির হোসেন আমু, আবদুর রাজ্জাক, তোফায়েল আহমদসহ শত শত আওয়ামী লীগ নেতা-কর্মীকে বন্দী করা হয়। কিন্তু জেলাখানাতেও জীবনের নিরাপত্তা ছিল না। স্বাধীনতার সরকার পরিচালিত দৈনিক বাংলায় নির্মল সেন লিখেছিলেন 'স্বাভাবিক মৃত্যুর গ্যারান্টি চাই' শিরোনামের একটি উপসম্পাদকীয়। আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি বোঝানোর জন্য বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডে জড়িত কুচক্রী মহল এ লেখার উদ্ধৃতি দিয়েছে বিভিন্ন সময়ে। অথচ ১৫ আগস্ট ও ৩ নভেম্বর গভীর রাতে স্বাধীনতা সংগ্রামে নেতৃত্বদানকারী মহান নেতারা এমনকি নিজ বাসভবন কিংবা কারাগারেও নিরাপদ ছিলেন না! নারী-শিশুরাও নিরাপদ থাকলেন না! এ সব হত্যাকাণ্ডের যেন বিচার না হতে পারে সে জন্য খন্দকার মোশতাক আহমদ ২৬ সেপ্টেম্বর (১৯৭৫) জারি করে কুখ্যাত ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ। কিন্তু জিয়াউর রহমান (যাকে সবচেয়ে বিশ্বস্ত ও আস্থাভাজন ব্যক্তি হিসেবে খন্দকার মোশতাক আহমদ বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের এক সপ্তাহ যেতে না যেতেই ২৪ আগস্ট নিয়োগ দেয় সেনাবাহিনী প্রধান হিসেবে। বিচারপতি আবু সাদাত মোহাম্মদ সায়েম বঙ্গভবনে শেষ দিনগুলি গ্রন্থের ২৯ পৃষ্ঠায় লিখেছেন, 'মিলিটারি মানে সেনাবাহিনী। আর মিলিটারি বা সেনাবাহিনীর শাসন মানে সেনাপ্রধানের নেতৃত্ব) জানত- আইনে পরিণত না হলে অধ্যাদেশের কার্যকারিতা থাকে না। তাই ১৯৭৯ সালের এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে বিএনপি বা বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের দ্বিতীয় জাতীয় সংসদে যখন নিরঙ্কুশ কর্তৃত্ব, তখন এই কুখ্যাত ইনডেমনিটি অধ্যাদেশকে আইনে পরিণত করে বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের বিচার বন্ধ রাখার ঘৃণ্য অপপ্রয়াস চালানো হয়। জিয়াউর রহমান এবং তার দল বিএনপি এ দায় কী করে এড়াবে?

'বাংলাদেশ: রক্তের ঋণ' গ্রন্থে অ্যান্থনি মাসকারেনহাস লিখেছেন- বঙ্গবন্ধুর খুনে সরাসরি সংশ্লিষ্ট রিসালদার মোসলেহউদ্দিন তাঁর দলবল নিয়ে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে চারনেতাকে হত্যার জন্য হাজির হয়। কারা কর্তৃপক্ষ তাদের বাধা দিলে বঙ্গভবন থেকে টেলিফোনে খন্দকার মোশতাকের নির্দেশ যায়- ওরা যা করতে চায়, করতে দাও। তাজউদ্দিনের সেলে চারনেতাকে খুব কাছ থেকে ব্রাশফায়ার করে হত্যা করা হয়। সে সময় সুপ্রিম কোর্টের তিনজন বিচারপতি সমন্বয়ে জেলহত্যার তদন্তের জন্য একটি কমিশন গঠন করলেও জেনারেল জিয়াউর রহমান তার সাড়ে পাঁচ বছরের শাসনামলে ওই তদন্ত কমিশনকে কাজ করতে সম্মতি দেয়নি। [পৃষ্ঠা ১২৭-১২৮]

জিয়াউর রহমানের শাসনামল কিংবা পরবর্তী সময় এইচ এম এরশাদ ও খালেদা জিয়ার শাসনামলে কেন বঙ্গবন্ধু ও জেল হত্যাকাণ্ডের বিচার করতে দেওয়া হয়নি? এর কারণ বুঝতে আমাদের সমস্যা হয় না- ২১ বছরে অন্যায়ভাবে ক্ষমতায় থাকা অপশক্তির ভয় ছিল- তাদের মুখোশ খুলে পড়বে।

বঙ্গবন্ধু হত্যকাণ্ডের পর সামরিক শাসন জারি হয়। অ্যান্থনী মাসকারেণহাস 'বাংলাদেশ: রক্তের ঋণ' গ্রন্থে লিখেছেন, 'জেনারেল জিয়া তাঁর দল বিএনপিতে সকল দল ও মতাদর্শের লোকদের একত্রে জমায়েত করে। অসময়ে শেখ মুজিবের মৃত্যুতে সবচেয়ে লাভবান হয় বিএনপি। জিয়াউর রহমানের দল বিএনপি পাকিস্তানি দালালদের জন্য তার সবগুলো সদর দরজা খুলে দিয়েছিল।

১৯৭৯ সালের সংসদ নির্বাচনে বিএনপি থেকে পদপ্রার্থীদের মধ্যে ২৫০ জনই ছিল ওই দালাল গোত্রের রাজনীতিবিদ। তাদের অধিকাংশই শেখ মুজিবের আমলে পাকিস্তানি শাসকচক্র ও হানাদার বাহিনীর সঙ্গে দালালির অভিযোগে অভিযুক্ত হয় এবং সাজা ভোগ করে।' ['বাংলাদেশ: রক্তের ঋণ', পৃষ্ঠা ১৬৩]

জিয়াউর রহমান কীভাবে বিচারপতি আবু সাদাত মোহাম্মদ সায়েমের কাছ থেকে প্রধান সামরিক আইন প্রশাসকের পদ কেড়ে নেয়, তার বিবরণ রয়েছে 'বাংলাদেশ: রক্তের ঋণ' গ্রন্থে। এতে অ্যান্থনী মাসকারেণহাস লিখেছেন- 'জিয়া ২৮ নভেম্বর (১৯৭৬) সিদ্ধান্ত নেয়- প্রেসিডেন্ট সায়েমকে একসঙ্গে রাষ্ট্রপতি ও প্রধান সামরিক আইন প্রশাসকের দায়িত্বে রাখা তাঁর জন্য বিপজ্জনক। সে ডেপুটি চীফ অব আর্মি স্টাফ জেনারেল এইচ এম এরশাদ, চীফ অব স্টাফ জেনারেল আবুল মঞ্জুর, নবম ডিভিশনের কমান্ডার জেনারেল মীর শওকত আলী, নৌ ও বিমান বাহিনীর প্রধান এবং বিচারপতি আবদুস সাত্তারকে নিয়ে বঙ্গভবনে গিয়ে প্রধান সামরিক আইন প্রশাসকের পদটি তার কাছে ছেড়ে দিতে বলে। রাষ্ট্রপতি সায়েম এতে রাজি ছিলেন না। এক পর্যায়ে বিচারপতি সাত্তার বলেন- ভাই, জিয়া যখন সিএমএলএ পদটি চাইছে, পদটি আপনি তাকে দিয়ে দিন। রাত ১ টার দিকে বিচারপতি সায়েম প্রধান সামরিক আইন প্রশাসকের পদ হস্তান্তরের কাগজে সই করেন।' [পৃষ্ঠা ১৫৫-১৫৬]

বিচারপতি আবু সাদাত মোহাম্মদ সায়েম তাঁর 'বঙ্গভবনে শেষ দিনগুলি' গ্রন্থে বেদনা ও ক্ষোভের সঙ্গে লিখেছেন, 'আমি প্রধান সামরিক আইন প্রশাসকের পদ ছেড়ে দিই উপপ্রধান সামরিক আইন প্রশাসক জিয়াউর রহমানের হাতে। ১৯৭৭ সালের ২১ এপ্রিল তার হাতেই ছেড়ে দিই রাষ্ট্রপতির পদ।' [পৃষ্ঠা ৩৫]

এ গ্রন্থেই বিচারপতি সায়েম জিয়াউর রহমানকে তুলনা করেছেন বাংলাদেশে গণহত্যার প্রধান হোতা জেনালের ইয়াহিয়া খানের সঙ্গে। কারণ দু'জনেই একইসঙ্গে সেনাবহিনী প্রধান, সশস্ত্র বাহিনী প্রধান, প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক ও রাষ্ট্রপতি পদে অধিষ্ঠিত ছিল। [পৃষ্ঠা ২২]

জিয়াউর রহমান ক্ষমতা নিরঙ্কুশ করার পর বিচারপতি আবদুস সাত্তারকে উপরাষ্ট্রপতি পদে মনোনীত করেছিল।

বন্দুক-মেসিনগান-ট্যাংকের দাপট দেখিয়ে ক্ষমতা দখল করে রাখা জিয়াউর রহমান তার পূর্বসুরি পাকিস্তানের আইয়ুব খান ও ইয়াহিয়া খানের মতোই সরকারবিরোধী সব ধরনের রাজনৈতিক কর্মকান্ড নিষিদ্ধ করেছিল, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা কেড়ে নিয়েছিল। অন্যায়ের প্রতিবাদ করার উপায় ছিল না। ন্যায়ের পক্ষে কেউ দাঁড়াতে পারেনি। বঙ্গবন্ধু হত্যার প্রতিবাদে ছাত্রলীগ ও ছাত্র ইউনিয়ন 'সংগ্রামী ছাত্রসমাজ'-এর ব্যানারে ৪ নভেম্বর (১৯৭৫) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বটতলা থেকে ধানমন্ডি ৩২ নম্বর সড়কে বঙ্গবন্ধুর বাসভবনে শোক মিছিল নিয়ে যায়। পরদিন ঢাকায় হরতাল আহ্বান করা হয় জেল হত্যাকান্ডের প্রতিবাদে। ৪ নভেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সিনেট অধিবেশনে বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেসর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের হত্যার নিন্দা জ্ঞাপন এবং এর সঙ্গে জড়িতদের বিচার দাবি করা হয়। কিন্তু যত প্রতিবাদ হোক সামরিক শাসনের নিষ্ঠুর যাতাকলে তা সংবাদপত্র বা বেতার-টেলিভিশনে প্রকাশ-প্রচারের সুযোগ নেই। এখন বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনা বেতার-টিভি-সংবাদপত্রের দুয়ার খুলে দিয়েছেন। সবার রয়েছে মতপ্রকাশের সুবিধা। এ সুবিধার অপব্যবহার হতেও আমরা দেখি। কিন্তু জিয়াউর রহমান বা এইচ এম এরশাদের শাসনামলে 'কেউ কিছু বলতে পারবে না- মুখ বুঝে সহ্য কর' নীতি অনুসরণ করা হতো। জিয়াউর রহমান মুক্তিযুদ্ধের রণধ্বনি 'জয় বাংলা' এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নাম উচ্চারণ নিষিদ্ধ করেছিল। পাকিস্তান আমলে এ ভূখন্ড শোষণ করেছিল কারা, মুক্তিযুদ্ধ হয়েছিল কোন অপশক্তির বিরুদ্ধে- এ সব প্রশ্নে পাকিস্তানের নাম উচ্চারণ বন্ধ হয়ে যায়। বাংলাদেশ বেতারের নাম বদল করে পাকিস্তান আমলের কায়দায় রেডিও বাংলাদেশ রাখা হয়। ১৯৭১ সালে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর গণহত্যা-ধর্ষণ-লুটপাটে প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণকারী দল জামায়াতে ইসলামী, মুসলিম লীগ প্রভৃতি দলকে নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। জিয়াউর রহমান ক্ষমতায় এসে এ নিষেধাজ্ঞা তুলে নেয়, কারাগারে বন্দি গণহত্যার নিষ্ঠুর অপরাধে জড়িত রাজাকার-আলবদরদের মুক্তি দেয়। পাকিস্তান ও সৌদি আরবে পালিয়ে থাকা একাত্তরের যুদ্ধাপরাধীদের বাংলাদেশে ফেরত এনে রাজনৈতিক কর্মকান্ড পরিচালনার অধিকার প্রদান করে। তার এবং পরবর্তী শাসকদের দুঃশাসনের আমলে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতি থমকে যায়।

বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনা ১৫ আগস্ট ও ৩ নভেম্বরের জেল হত্যাকান্ডে জড়িতদের বিচার করেছেন। কয়েকজন যুদ্ধাপরাধীদের বিচার হয়েছে এবং আরও অনেকে বিচারের অপেক্ষায়। যুদ্ধাপরাধ কখনও তামাদি হয় না- আবারও প্রমাণিত হয়েছে বাংলাদেশে। কিন্তু ১৫ আগস্ট ও ৩ নভেম্বর জেল হত্যাকান্ডের নেপথ্য কুশিলব কারা, এ ভয়ঙ্কর অপরাধের ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করেছিল কারা তার অনেক কিছুই এখনও দেশবাসীর অজানা। একটি উপযুক্ত কমিশন এ প্রশ্নের নিরসন করতে পারে, এমন অভিমত রয়েছে। সরকার এ পথে দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করবে, এমন প্রত্যাশা থাকল।

অজয় দাশগুপ্ত: বীর মুক্তিযোদ্ধা, একুশে পদকপ্রাপ্ত সাংবাদিক